দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 20 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
৭৫

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা-চিন্তা

অধ্যাপক আবদুল গফুর

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে লোকে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই জানে। তবে তিনি আজীবন রাজনীতি করলেও অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের মত ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে তিনি কখনও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন কৃষক-শ্রমিক ওনির্যাতিত জনগণের মুক্তির জন্য। অর্থাৎ তাঁর রাজনীতির পেছনে ক্ষমতা লোভ ক্রিয়াশীল ছিল না— ছিল এক মহৎ জীবনাদর্শের প্রেরণা। বলা বাহুল্য এ আদর্শ ছিল মানবতার শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক, বিশ্ব ইতিহাসের সেরা মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো বিপ্লবী জীবনাদর্শ। তবে অন্যান্য বহু ইসলাম পছন্দের মত তিনি কথায় কথায় ইসলামের মহান নাম ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে আগ্রহী ছিলেন না এবং নিজেদের জীবনে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, কোরবানী, জেহাদী প্রেরণা ও সহজ-সরল আদর্শের প্রতিফলন না ঘটিয়ে যারা ইসলামের উপর লম্বা লম্বা বক্তৃতা দানে অধিক আগ্রহী, তাদের সাথে তাঁর ছিল মৌলিক পার্থক্য। ফলে তিনি রাজনীতিবিদ হয়েও অন্যান্য বহু রাজনীতিবিদের চাইতে ছিলেন পৃথক, 'মওলানা' হয়েও অন্যান্য মওলানাদের থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র এবং 'বিপ্লবী' হয়েও অন্যান্য তথাকথিত বিপ্লবীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বিপ্লবী সত্তার পাশাপাশি আরেকটি সত্তা ছিল, তিনি ছিলেন একজন দরদী সমাজসেবী-শিক্ষাবিদ। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তা যারা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে না গেছে, তাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। যে কোন মানুষের জন্য তাঁর দরজা ছিল চির-উন্মুক্ত, কিন্তু নির্যাতিত ও বিপন্ন মানুষের জন্য তাঁর দরদ ছিল বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হলে সমাজের কল্যাণসাধন সম্ভব নয় বলে যে ধারণা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত রয়েছে তা তিনি একেবারেই মিথ্যা প্রমাণ করেন। তিনি জীবনে কখনও ক্ষমতায় যাননি, শুধু যাননি বললে ঠিক হবে না, তিনি চিরটাকাল ছিলেন সরকার-বিরোধী শিবিরে, বঞ্চিত-নির্যাতিত জনগণের দাবী-দাওয়া আদায়ের আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু এ জন্য তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ কখনও বসে থাকেনি। কী আসামের ঘাসমারী, বড়পেটা, রাধাবাড়ী, হামিদাবাদ আমতলী বা ভাসানচরের কথা বলি,

কী বাংলাদেশের মহিপুরে, তালোবা, ভুরুঙ্গামারী, পাঁচবিবি, সিরাজগঞ্জ, কাগমারী বা সন্তোষের কথা বলি সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ধ্বংসের নকীব (প্রফেট অব ডিসট্রাকশন) খেতাবপ্রাপ্ত এই বিপ্লবী- মহানায়কের মসজিদ, মকতব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, হেফজখানা, হাসপাতাল, কৃষি খামার, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগী খামার, বৃত্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা, হোস্টেল, মুসাফিরখানা, নার্সারী, নাইট স্কুল, পাঠাগার প্রভৃতি অসংখ্য সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার প্রতি ছিল মওলানার বিশেষ নজর। শিক্ষার অভাবে মানুষ যে মানুষ হয় না, দুনিয়া-আখেরাত কোনটারই জন্য সে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না, এ ব্যাপারে মওলানা ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। তিনি বলেছেন— "জীবনে

কালজয়ী ভাসানী

আমি দু'টি বিষয়ে সবসময় বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরেকটি হাসপাতাল।" প্রকৃত মানব দরদীর মতই তিনি মানুষের দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুভব করেছেন চিরকাল। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াই নয়, শিক্ষা যেন প্রকৃত মানবকল্যাণ বয়ে আনতে পারে এ বিষয়েও মওলানা ভাসানী আজীবন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা প্রয়াসকে প্রধানতঃ তিন ভাগ করা যায়। তিনি নিজে একজন আদর্শবাদী ছিলেন বিধায় তাঁর আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠুক এ কামনা তিনি অবশ্যই করতেন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠন চাট্টিখানি কথা নয়। কায়েমী স্বার্থবাদীরা পদে পদে এতে বাধা দেবে। শিক্ষা পুনর্গঠন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ততদিন মানুষকে শিক্ষার আলো থেকে একেবারে বঞ্চিত রাখা উচিৎ নয় বলেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যেখানে সম্ভব হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। এভাবেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাধীনে ভাসানের চরে, হামিদাবাদে ধরের বাড়ীতে, কাকুয়ায়, সিরাজগঞ্জে, পাঁচবিবিতে মাদ্রাসা-মক্তব স্থাপন করেছেন। তিনি হামিদাবাদে প্রতিষ্ঠা করেছেন হাই স্কুল ও ইসলামিয়া কলেজ, মহীপুরে হাজী মহসিন কলেজ, কাগমারীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, সন্তোষে নার্সারী স্কুল, বয়েজ হাই স্কুল, গার্লস হাই স্কুল, কৃষি কলেজ ও হেফজখানা। সন্তোষের জাহ্নবী হাই স্কুল পুনর্গঠন ছাড়াও তিনি অসংখ্য লুপ্তপ্রায় মাদ্রাসা-মক্তব-স্কুল পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করেছেন।

মওলানার শিক্ষা-প্রয়াসের দ্বিতীয় ধারা তাঁর পীর-মুরিদী ছিলছিলা। বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষাধিক মুরীদ ছিল, যাদের তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন অনানুষ্ঠানিক এই শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। তাঁর ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আদর্শ জীবন এইসব মুরীদদের সামনে সদা উন্মুক্ত থাকত। বাংলা আসামের গ্রাম-গ্রামান্তরের অসংখ্য অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত তাঁর এইসব মুরীদরা তাদের প্রিয় হুজুরের কাছ থেকে শুধু ধর্মীয় সবকই গ্রহণ করত না, ধর্মীয় সহজ-সরল সাম্য ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসার বিপ্লবে দীক্ষাও গ্রহণ করতো মওলানার কাছ থেকে। এই সহজ-সরল মুরীদরা তাঁর নিজস্ব জীবনাচারণ থেকে জীবনের আদর্শ গ্রহণ করতো বলেই ভাসানীর তথাকথিত শিক্ষিত ভক্তের অনেকের মধ্যে পরবর্তীকালে চরম বিচ্যুতি দেখা দিলেও এই মুরীদরা কেউ তাঁর মহৎ আদর্শ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হয় নাই।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা প্রয়াসের তৃতীয় দিকটি অবশ্যই তাঁর শিক্ষা-পুনর্গঠন, শিক্ষা-সংস্কার এবং নয়া আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। বস্তুত তাঁর স্বপ্নের এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর স্বপ্নের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপনিবেশিক শক্তি প্রবর্তিত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা কী হতে পারে তারই একটি নমুনা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী ছিলেন সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে। তিনি প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে যে প্রধান ত্রুটি আবিষ্কার করেন তা হচ্ছে এর মধ্যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয় অনুপস্থিত। মানব জীবনে যেমন দেহ ও আত্মার দু'টি সত্তা রয়েছে, তেমনি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় একই সঙ্গে দেহ ও আত্মার বিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উনিশ শ' সত্তর সালের জুন মাসে বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় "আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে ১৪/১৫টি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি এ বিষয়ে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু আদর্শেরপ্রশ্নে অনমনীয় মওলানা ভাসানী এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনা করেন তাতে ইসলামের আলোকে খাঁটি মানুষ সৃষ্টিই ছিল লক্ষ্য। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে শিক্ষা এমনভাবে বাস্তবমুখী হবে যাতে এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কেউ চাকুরী না পেয়ে হতাশায় না ভোগে, বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হালাল সম্মানজনক উপায়ে স্বাধীন জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়। মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্য স্থির করেন।

প্রথমতঃ এতে যে কোন ছাত্র কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞানে যেভাবেই পড়াশোনা করুক না কেন, একটি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। যেমন কেউ ইতিহাসে এম এ পড়লেও ইতিহাসের পাশাপাশি একটি কারিগরি বিষয়ে (যেমন তাঁতের কাজ) শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ফলে সে যদি তার ডিগ্রীভিত্তিক কোন চাকুরী নাও পায়, তাঁতের কাজ, সুতারের কাজ, ফিশারী, কৃষি, বিদ্যুৎ যে কোন কাজ করে যেন সে সংসার চালিয়ে নিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার দৈহিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকবে। এই সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন মানা এবং নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকবে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ধর্মের মূল শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দান করা হবে এবং এর উপর আমল করা বাধ্যতামূলক থাকবে

চতুর্থতঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকবে। কেরোসিন ও লবণ ছাড়া আর সব কিছুই যাতে নিজেরা উৎপাদন করে ব্যবহার করতে সকলে অভ্যস্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সারাদেশকে সর্বতোভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা সহজ হবে।

পঞ্চমতঃ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা বৎসরগুলোর মাঝে চার পাঁচ সপ্তাহকাল গ্রামে বা শিল্প এলাকায় গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হবে।

মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন মানুষ আল্লার সেরা সৃষ্টি এবং এই বিশ্ব চরাচরে সে রব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা আল্লাহর রবুবিয়ত তথা বিশ্ব পালন নীতির মাধ্যমে সমাজ, জাতি ও গোটা বিশ্বকে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে পরিচালিত করে ইহ ও পরলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কারণ একমাত্র এ পথেই আসবে মানব জন্মের সার্থকতা। মওলানা ভাসানীর এ শিক্ষা-চিন্তার ভিত্তিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠলে এ হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মহা গৌরবের ব্যাপার। শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভাসানী যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তা এক কথায় অনন্য।